মাইকেল মধুসুধন দত্তের জীবনের শেষ পর্ব : দ্বিশত জন্মবর্ষে স্মরণ ও শ্রদ্ধা

ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়

প্রাককথা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ – ২৯ জুন, ১৮৭৩), দ্বিশতবর্ষে পদার্পণ করেছেন । এখন থেকে দুইশত বছর আগে ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের (বর্তমান বাংলাদেশ) যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক জমিদার বংশে মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মায়ের নাম জাহ্নবী দেবী। পিতা কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল ছিলেন ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে বঙ্গ সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নূতন জীবনমন্ত্র তেজ ও বীর্যের পূর্ণবেগ নিয়ে । তাঁর জীবন কাহিনী তাঁর বর্ণময় সাহিত্যের মতই ছিল বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর । বাংলা সাহিত্যের আকাশে তাঁর আবির্ভাব ছিল এক বিশাল ও বিপুল ধুমকেতুর মত। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক, কবি ও নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা। তিনি বাংলা সনেট আর আধুনিক মহাকাব্যেরও জনক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত ।

মধুসুদনের দৃষ্টিকোণ, মননশীলতা,মানসিকতা এবং ব্যক্তিত্ব ছিল খ্যাতি ও অখ্যাতি এবং স্ববিরোধিতায় বিদীর্ণ। তিনি চোখ ধাঁধানো সাহিত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর অথচ ভিন্নতর তাঁর গতিপ্রকৃতি, স্বতন্ত্র তাঁর কক্ষপথ। মহাকবি হওয়া সত্বেও তিনি আজীবন সোনার হরিণের পিছনে লোভের তাড়নায় ধাবমান এবং আঘাতে ও প্রত্যাঘাতে জর্জরিত হয়েও ধনীর মত বিলাসী যাপনের তীব্র কামনায় থেকেছেন মশগুল। প্রতিভা ও প্যাশন, আকাঙ্খা ও আকিঞ্চন, বৈপরিত্য ও নাটকীয়তা এবং বিশৃঙ্খলা ও হঠকারীতার অন্তহীন দ্বন্দে তাঁর ব্যক্তিজীবন ছিল দীর্ণ, বিধ্বস্ত,বিপন্ন। বিরাট পরিবৃত্তির একজন শিল্পীর জন্যে যা স্বাভাবিক,তিনি এমন এক জটিল মনের মানুষ ছিলেন যা তাঁকে অসুখী করতে বাধ্য। প্রাচ্যে জন্মেও তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মূল্যবোধে। কলেজের শিক্ষাপর্বেই খ্রীষ্ঠধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য তাঁর নামের আগে "মাইকেল" শব্দটি গেঁথে যায়। অথচ প্রাচ্যের প্রতি সহজাত দরদ তাঁকে পাশ্চাত্যের সাথে একাত্ম হতে দেয় নি।এই দুয়ের সমন্বয় করতে পারেন নি, যেমন পারেন নি লক্ষী ও সরস্বসতীর মধ্যে একটা সামন্জস্য গড়ে তুলতে।

কলকাতায় শিক্ষাপর্ব সাঙ্গ হবার পরবর্তী পর্যায়ের কবির জীবনকালকে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বিভক্ত করা যায় :

*কলকাতা – মাদ্রাজ (ডিসেম্বর ১৮৪৮) / * মাদ্রাজ -কলকাতা (জানুয়ারি ১৮৫৬) / * কলকাতা – ইংল্যান্ড/ ফ্রান্স (জুন ১৮৬২) / * ইংল্যান্ড -কলকাতা (জানুয়ারি ১৮৬৭) এই চারটি অধ্যায়ে।

এর মাঝে মে-জুন ১৮৫১ অল্প সময়ের জন্য কলকাতা আসেন পিতা রাজনারায়ন দত্ত কবির মায়ের (জাহ্নবী দেবী) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। দ্রুত ফিরে যান মাদ্রাজে।

যৌবনকাল থেকে তাঁর লালিত স্বপ্ন ছিল বৃটিশ সাহেবের দেশ থেকে ব্যরিষ্টারি পাশ করে দেশে ফিরে প্রচূর অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল আয়েসী জীবনযাপন। অথচ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার

জন্য উথালপাথাল আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই কখনো তিনি করেন নি। আজীবন রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে।

স্থানাভাবের জন্য আলোচ্য নিবন্ধে আমরা শুধুমাত্র কবির শেষ জীবনকালকে বিবৃত করব।

শেষপর্ব

১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী ২য় স্ত্রী হেনরিয়েটা ও তিন সন্তানকে বিলেতে ফেলে রেখে, বিদ্যাসাগর মহায়শের পাঠানো টাকায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতার জন্য রওনা হন – পৌছান ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে। ব্যারিষ্টারি পেশা জমলো না । ব্যারিষ্টার হও সত্বেও সাহেবদের কাছ থেকে বর্ণবিদ্বেষবাদ ছিল অব্যহত। একসময় আদালত থেকেও ব্যারিষ্টার পদটিও কেড়ে নেওয়া হল। তারপর বেহিসবি ও অমিতব্যায়ী দিনযাপন, প্রচুর ধারদেনা এবং একরোখা ব্যক্তিত্বের ফলে মুষ্টিমেয় শুভানুধ্যায়ীদেরও অচিরেই বিরাগভাজন হতে হল। ১৮৬৯ সালের মে মাসে হেনরিয়েটা তিন সন্তানকে নিয়ে কলকতায় ফিরে এলেন। তখন কবি হতদরিদ্র। যে ধরণের ছোটখাটো আইনি কাজকে ঘৃণা করতেন তাই তখন তাকে দুবেলা ডালভাত জোটাত।

১৮৭৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন তার অবস্থা বয়সের চেয়েও বেশি বার্ধক্য-কবলিত। স্ত্রী হেনরিয়েটার স্বাস্থ্যও নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হয়। অপরিমিত মদ্যপান, চিকিৎসার ধারাবাহিকতায় ছেদ, অমিতচারীতার ফল কবির শরীর সইতে পারেনি। উত্তরপাড়া লাইব্রেরির ওপর তলায় আশ্রয় পেলেন কবি। রইলেন ছয় সপ্তাহ। উত্তরপাড়ায় কবির শরীর-স্বাস্থ্য ও কার্যকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে তাঁর উচিত ছিলো, পাঠগৃহে নয়, চিকিৎসাস্থল আলিপুরের জেনারেল হাসপাতালে যাওয়া। কারণ, এ সময়ে তিনি এবং হেনরিয়েটা, উভয়েই খুব অসুস্থ ছিলেন। কে বেশি অসুস্থ বলা মুশকিল হলেও সুস্থ্যতা দু'জনের ধারে কাছেও ছিলো না।

এই সংকটকালে মাইকেল আরাম কেদায় বসে চোখ বুজে পড়ে থাকতেন। দেখলে মনে হতো, যেন একটি কঠিন হিসাব মেলাতে চেষ্টা করছেন। কী আশা করেছিলেন আর কী অর্জন করেছিলেন ! সম্ভবত এ কারণেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের নাম তাঁর জীবনেরই মতো এবং তার কবিতার উদ্‌ধৃতির মাধ্যমে বিধৃত গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি' (১৯৯৫)।

মাইকেল যখন নিদারুণ অসহায় অবস্থায় উত্তরপাড়ায় বসবাস করছেন, তখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হয়ে আসেন মাইকেল-বন্ধু গৌরদাস বসাক। তিনি এ সময়ে একাধিকবার উত্তরপাড়ায় গিয়ে মাইকেলকে দেখে আসেন। শেষ বার সেখানে তিনি যে দৃশ্য দেখতে পান, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন: "মধুকে দেখতে যখন শেষ বার উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগারের কক্ষে যাই, তখন আমি যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখতে পাই, তা কখনো ভুলতে পারবো না। সে সেখানে গিয়েছিলো হাওয়া বদল করতে। সে তখন বিছানায় তার রোগযন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিলো। মুখ দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছিলো। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়েছিলো। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মধু একটুখানি উঠে বসলো। কেঁদে ফেললো তারপর। তাঁর স্ত্রীর করুণ অবস্থা তাঁর পৌরুষকে আহত করেছিলো। তাঁর নিজের কষ্ট এবং বেদনা সে তোয়াক্কা করেনি। সে যা বললো, তা হলো, 'afflictions in battalions.' আমি নুয়ে তাঁর স্ত্রীর নাড়ী এবং কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ দেখলাম। তিনি তাঁর আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিম্নকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে দেখতে হবে না, ওঁকে দেখুন, ওঁর পরিচর্যা করুন। মৃত্যুকে আমি পরোয়া করিনে'। "

বাল্যবন্ধুর অন্তিম দশা দেখে গৌরদাস স্বভাবতই বিচলিত বোধ করেন। তিনি তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেন। জানা গেলো, পরের দিন, ২০ কিংবা

২১ জুন (১৮৭৩), মধু নিজেই কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সপরিবারে কবি বজরায় করে নৌপথে নির্ধারিত দিনে অসুস্থ শরীরে নিজ উদ্যোগেই কলকাতা যাত্রা করলেন।

কলকাতায় হেনরিয়েটাকে ওঠানো হলো তার জামাতা উইলিয়াম ওয়াল্টার এভান্স ফ্লয়েডের বাড়িতে, ১১ নম্বর লিন্ডসে স্ট্রিটে। ইংরেজ এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়া লিন্ডসে স্ট্রিট চৌরঙ্গি রোডের সঙ্গে সংযুক্ত। স্ত্রীর সংস্থান হলেও মাইকেলের নিজের ওঠার মতো কোনও জায়গা ছিলো না। উত্তরপাড়ায় যাওয়ার আগেই তিনি তার এন্টালির বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অগত্যা মাইকেল ঠাঁই নিলেন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে।

সে আমলে দেশীয় ভদ্রলোকরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়াকে কালাপানি পার হওয়ার মতো শাস্ত্রবিরুদ্ধ একটি অসাধারণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করতেন। ফলে এই হাসপাতালটি ছিলো মূলত বিদেশী এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত। কিছু বিশিষ্টজনের তদবিরে এবং মাইকেলের নিজের সাহেবী পরিচয়ের জন্য তিনি অবশেষে এ হাসপাতালে ভর্তির অনুমতি পেলেন। হাসপাতালে আসার পর প্রথম দিকে শুশ্রুষা এবং ওষুধপত্রের দরুণ তার রোগ লক্ষণের খানিকটা উপশম হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তার স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যায়। যকৃৎ, প্লীহা এবং গলার অসুখে তার দেহ অনেক দিন থেকেই জীর্ণ হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় তার যকৃতের সিরোসিস থেকে দেখা দিয়েছিল উদরী রোগ। সেই সঙ্গে হৃদরোগের লক্ষণও স্পষ্ট দেখা দেয়। সব মিলিয়ে তার শরীর শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে একজন 'সাহেব-কবি' অকৃপণভাবে মধুভাণ্ডার তৈরি করেছিলেন, যার স্বাদ পুরোপুরিভাবে তার স্বজাতি গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছিল। বরং অবজ্ঞা ও সমালোচনায় 'জাত-ত্যাগী' কবিকে ভর্ৎসনা করেছিল। সেই মধুনির্মাতা মধুকবি মারা যাচ্ছেন শুনে আলিপুর হাসপাতালে অনেকের ভিড় দেখা যায়। তাঁর চরম দুরবস্থার খবর শুনেও এতোদিন যারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তারাও এসে হাজির। রক্তের আত্মীয়তা সত্ত্বেও যারা একদা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, তাদের মনেও হয়তো করুণা বা লোকলজ্জা হানা দিয়েছিল; তারাও এলেন।

কবি তখন ভালো করেই অনুভব করতে পারছিলেন যে, তিনি মারা যাচ্ছেন; তবে ভালো হয়ে উঠবেন, এই স্বপ্নও তিনি দেখছিলেন। এরূপ বিপন্ন অবস্থাতেও তিনি বেহিসাবী স্বভাবের প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। ধার করে হলেও ব্যয় করার এবং বদান্যতা দেখানোর প্রবণতা তিনি এ সময়েও ত্যাগ করতে পারেননি। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর এক সময়ের মুন্সি মনিরউদ্দিন। কবির কাছে তার চারশো টাকা পাওনা ছিলো। তারপরেও কবি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো টাকা পয়সা আছে কিনা? মনিরউদ্দিন তার কাছে মাত্র দেড় টাকা আছে বলে জানালেন। সেই পয়সাই তিনি চাইলেন। তারপর তা বকশিস হিসাবে দান করলেন তাঁর শুশ্রুষাকারিণী নার্সকে। মৃত্যুকালেও ধার করে বকশিশ দেওয়ার এই আচরণ সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তার সারা জীবনের অভ্যাসের সঙ্গে।

কবি হাসপাতালে ছিলেন সাত অথবা আট দিন। এ সময়ে কিছু চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন পেলেও কবি খুব একটা মানসিক শান্তিতে ছিলেন না। পরিবার সম্পর্কে তার দুশ্চিন্তা এবং হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তার উদ্বেগ তাকে বিচলিত করে। এরই মাঝে হাসপাতালের শয্যায় শায়িত চরম অসুস্থ কবি এক পুরনো কর্মচারীর মাধ্যমে ২৬ জুন (১৮৭৩) একটি মর্মান্তিক বেদনার খবর পেলেন, স্ত্রী হেনরিয়াটার মৃত্যুর সংবাদ। মাত্র ৩৭ বছর তিন মাস ১৭ দিন বয়সে হেনরিয়েটা মারা গেলেন। হেনরিয়েটা বয়ঃসন্ধিকালে মা মারা যাওয়ার পর থেকে সুখের মুখ কমই দেখেছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতা এসেছিলেন মাইকেলের ভালোবাসার টানে। চার্চে গিয়ে সেই ভালোবাসার কোনো স্বীকৃতি পর্যন্ত তিনি আদায় করেননি। এমন প্রেয়সীর মৃত্যু সংবাদ কবির কাছে প্রচণ্ড আঘাত হয়ে এসেছিল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মাইকেলের মুখ থেকে প্রথম যে কথাটি বের হয়: "বিধাতা তুমি একই

সঙ্গে আমাদের দুজনকে নিলে না কেন ?" হেনরিয়েটার শর্তহীন ভালোবাসা এবং নীরব ত্যাগের কথা অন্য সবার চেয়ে মাইকেলই ভালো করে জানতেন। সুতরাং যতো অনিবার্য হোক না কেন, হেনরিয়েটার প্রয়াণে মৃত্যুপথযাত্রী কবি খুবই মর্মাহত ও বিষণ্ন হয়েছিলেন। এর ফলে তার অসহায়ত্ব ও যন্ত্রণা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি খুবই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন হেনরিয়েটার শেষকৃত্যের ব্যাপারে। এর জন্যে যে অর্থ, যোগাড়-যন্ত্র লাগবে, তা কোথা থেকে আসবে? তিনি সঞ্চয়ী লোক ছিলেন না। কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যুতে মাইকেল তখন নিজেও মৃত্যু পথযাত্রী।

এই দিনই অথবা পরের দিন হাসপাতালে শয্যাগত মাইকেলের কাছে স্বজন মনোমোহন ঘোষ আসেন সঙ্গে দেখা করতে ও সান্তনা দিতে। কবি তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, ঠিকমতো হেনরিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে কিনা। মনোমোহন জানালেন, সবই যথারীতি হয়েছে। মাইকেল জানতে চান, বিদ্যাসাগর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এসেছিলেন কিনা। মনোমোহন জানালেন, তাদের খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

স্ত্রী বিয়োগের ফলে অসহায় কবির সামনে আরেকটি মারাত্মক উদ্বেগের কারণ এসে উপস্থিত হয় দুই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা। তাঁর পুত্রদের একটির বয়স তখন মাত্র বারো এবং অন্যটির মোটে ছয়। কনিষ্ঠ সন্তান ইতিমধ্যেই প্রয়াত। মনোমোহন এই অবস্থায় কবিকে আশ্বস্ত করে বলেন, তাঁর সন্তানরা খেতে-পরতে পারলে কবির পুত্ররাও পারবে। এ প্রতিশ্রুতি মনোমোহন পরে যথাসম্ভব পালন করেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধর্ম, বিধি, শাস্ত্র, প্রথা-এর কোনোটিই মান্য করেননি। ধর্মান্তরিত হলেও ধর্মনিষ্ঠ হননি কখনই। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিলো না। এমনকি, অসহায় অবস্থায় নিজের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মৃত-স্ত্রীর করুণ-স্মৃতি আর নাবালক সন্তানদের অন্ধকার-ভবিষ্যতকে সামনে নিয়েও মাইকেল ধর্মের প্রতি আস্থাহীনতা প্রদর্শন করলেন। অবস্থা এমন ছিলো যে, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এবং রেভারেন্ড চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বরং কবির পারলৌকিক মঙ্গল নিয়ে কবির চেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। বিশেষত চন্দ্রনাথ কবিকে এ সময়ে বার বার নাকি পরম ত্রাতা যীশু খ্রিস্টের কথা মনে করিয়ে দেন। মাইকেল জীবনীকার গোলাম মুরশিদ লেখেন: "পারলৌকিক মঙ্গলের ব্যাপারে তাদের এই উৎকণ্ঠা দিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে তারা কবির প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা করেন বলেই মনে হয়। "

২৮ জুন তারিখে সমস্ত আশা-ভরসাহীন, রোগকাতর, বিষণ্ন কবি যখন কেবলমাত্র মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, তেমন সময়ে চন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে যুক্ত হন কৃষ্ণমোহন। উদ্দেশ্য: খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী কবির শেষ স্বীকারোক্তি আদায় করা। কবি কোনো পাপের কথা স্বীকার করে বিধাতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, এমন তথ্য কেউ জানেন না। জীবনকে যিনি নিজের ইচ্ছায় যদ্দুর সম্ভব উপভোগ ও অপচয় করেছিলেন, আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে তিনি আকুল হননি। প্রথাগত চিন্তায় এর চেয়ে অধার্মিকতা আর কিছুই হতে পারে না। প্রাচ্যদেশের ধর্মে জীবনভর পাপ করে শেষজীবনে অনুতাপের যে ধারা প্রচলিত রয়েছে, মাইকেল সেটাকেও অস্বীকার করলেন। ধর্মগত বিশ্বাস ও আচরণের এহেন পরিস্থিতিতে কৃষ্ণমোহন এবং চন্দ্রনাথ আশঙ্কা প্রকাশ করে কবিকে জানান যে, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং তাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হবে, তা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। এমন আস্থাহীন অবস্থায় মাইকেলের নির্ভীক উত্তর ছিলো: "মানুষের তৈরি চার্চের আমি ধার ধারিনে। আমি আমার স্রষ্টার কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে তাঁর সর্বোত্তম বিশ্রামস্থলে লুকিয়ে রাখবেন। আপনারা যেখানে খুশি আমাকে সমাধিস্থ করতে পারেন; আপনাদের দরজার সামনে অথবা গাছ তলায়। আমার কঙ্কালগুলোর শান্তি কেউ যেন ভঙ্গ না করে। আমার কবরের ওপর যেন গজিয়ে ওঠে সবুজ ঘাস। "

২৯ জুন ১৮৭৩, রোববার, মাইকেলের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এলো। তার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সন্তানারা এলেন তাকে শেষ বারের মতো দেখতে। এমন কি, তার যে জ্ঞাতিরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগের কারণে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে মাত্র একজন এসেছিলেন তাকে দেখতে। জীবনের শেষ দুই বছর কবির নিদারুণ দুর্দশায় সহায়তার হাত প্রসারিত না করলেও, শেষ মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রী কবিকে দেখে অনেকেই করুণায় বিগলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্রামহীন, আঘাতে-উদ্বেগে-পীড়ায় জর্জরিত এবং রোগশীর্ণ দেহ কবি আর ধরে রাখতে পারলেন না। বেলা দুইটার সময়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের জন্যে।

মৃত্যুর পরেও হেনস্থা

মাইকেলের ক্ষেত্রে মৃত্যুপরবর্তী ধর্মীয় কাজের সমস্যাজনিত আশঙ্কা প্রবলভাবে সত্যে পরিণত হলো। তার মৃত্যুর পর সত্যি সত্যিই তার শেষকৃত্য নিয়ে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিলো। যদিও মৃত্যুর শেষ বিদায়ে থাকার কথা ক্ষমা ও প্রার্থনা, মাইকেলকে সেটা থেকেও বঞ্চিত করা হলো। কলকাতার তৎকালীন খ্রিস্টান সমাজ তার দীক্ষার ঘটনা নিয়ে ঠিক তিরিশ বছর আগে একদিন মহা হৈচৈ করলেও, মৃত্যুর পর তাকে মাত্র ছয় ফুট জায়গা ছেড়ে দিতেও রাজি হলো না। ইংলিশম্যানের মতো পত্রিকাগুলো তার মৃত্যুর খবর পর্যন্ত ছাপলো না। যদিও সে সপ্তাহে কলকাতায় মোট কয়জন দেশীয় ও খ্রিস্টান মারা যান এবং আগের সপ্তাহের তুলনায় তা বেশি, না কম, সে পরিসংখ্যান নিয়েও পত্রিকাটি আলোচনা করে। মিশনারিদের কাগজ ফেন্ড অব ইন্ডিয়া খুবই সংক্ষেপে তার মৃত্যু সংবাদ ছাপালো। সংবাদটি তার কবি-কৃতীর ধারে-কাছে দিয়েও গেলো না, পত্রিকাটি গুরুত্বের সঙ্গে যা ছাপালো, তা হলো, তার জীবন-যাপনের অভ্যাসগুলো ছিলো অনিয়মে ভরা আর তিনি তার পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরেকটি প্রসঙ্গ এ পত্রিকায় উল্লেখ ছিলো, 'তিনি তার তিনটি সন্তানের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি।' নবদীক্ষিত খ্রিস্টান মাইকেলের প্রতি খ্রিস্টান সমাজ যে মনোভাব দেখায়, তা দুঃখজনক এবং তার পূর্বতন স্বজাতি হিন্দু সমাজের কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের সঙ্গে তুলনীয়। তবে মৃত্যুকালীন আচরণ অভাবনীয় কঠোরতা আর ক্ষুদ্রতার পরিচয় বহন করে। কেননা, মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতি এ রকমের রোষের ঘটনা ক্বচিৎ দেখা যায়। যার সঙ্গে মাইকেলের কবিতার মিল না থাকলেও, ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়, সেই শার্ল বোদলেয়ারের মৃত্যুর পরেও তার প্রতি অনেকের আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছিল। তার স্বীকারোক্তি-বক্তব্য নিয়ে, তার কবি-কৃতী নিয়ে অনেকে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যসাধকদের বেশিরভাগই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আসেননি। কিন্তু ফরাসি সমাজ তার মৃতদেহ সৎকারের ঘটনা নিয়ে এমন অমানবিক আচরণ করেনি, যেমনটি করা হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রে।

জুনের শেষ পাদে দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে মাইকেলের মৃত্যু হলেও, খ্রিস্টান সমাজের সৃষ্টি-ছাড়া রোষের দরুণ সেদিন এবং সেদিন রাতে তার মরদেহ পড়ে থাকলো দুর্গন্ধ-ভরা নোংরা মর্গে। কৃষ্ণমোহন ছিলেন কলকাতার খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের মধ্যে একজন প্রবীণ সদস্য, যদিও তিনি এ সময়ের অনেক আগে থেকেই সরাসরি ধর্মযাজকের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশপস কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন এবং মাইকেল মারা যাওয়ার আগের সময়কালে অধ্যাপনা থেকেও অবসর নিয়েছিলেন, তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে নিজে ছুটে গিয়ে তদবির করলেন লর্ড বিশপ রবার্ট মিলম্যানের কাছে। মিলম্যান এর ছয় বছর আগে বিশপ হয়ে কলকাতায় আসেন। দেশীয়দের এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার বেশ ভালো সম্পর্ক ছিলো। তিনি বাংলাসহ বেশ কয়েকটি দেশীয় ভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। এমনকি, তিনি নিজে দুই খণ্ডে মাইকেলের প্রিয় কবি ত্যাসোর জীবনীও লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি তার ধর্মযাজকদের 'বিতর্কিত' বিষয়ে যোগদানে বাধা দিতেন। এহেন লর্ড বিশপ রবার্ট মিলম্যান মাইকেলের মৃত্যুর পরের দিন সকালেও কবির মৃতদেহ

খ্রিস্টানদের গোরস্থানে সমাহিত করার অনুমতি দিলেন না! অন্যদিকে, মাইকেলের স্বদেশবাসী ও ধর্মগোষ্ঠীর হিন্দু সমাজও তাকে গঙ্গার ঘাটে পোড়াতে আগ্রহী হলো না। সুতরাং আষাঢ় মাসের ভেপসা গরমের মধ্যে মাইকেলের অসহায় মরদেহ মর্গেই পচতে থাকে। স্বধর্ম ও স্বজাতির কাছে 'সিদ্ধান্তহীন ও আগ্রহরহিত' মাইকেলের নিঃসঙ্গ ও অভিভাবকহীন মরদেহ তৎকালীন কলিকাতার বাঙালি হিন্দু ও খ্রিস্ট সমাজের কাছে কলঙ্কচিহ্নস্বরূপ অপাঙতেয় ছিলো, যদিও সেই ঐতিহাসিক মৃতদেহটি বস্তুতপক্ষে বাঙালি হিন্দু ও খ্রিস্ট সমাজের তৎকালীন নানা পশ্চাৎপদতা ও কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষই করছিল।

অবশেষে মাইকেল-মৃতদেহ-সমস্যার সমাধান হলো, যখন সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন একজন ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক। তিনি কবির মরদেহ সমাধিস্থ করার সংকল্প প্রকাশ করেন। প্রায় একই সময়ে অ্যাংলিকান চার্চের একজন সিনিয়র চ্যাপেলেইন, যার নাম রেভারেন্ড পিটার জন জার্বো, বিশপের অনুমতি ছাড়াই তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার উদ্যোগ নেন।

৩০ জুন বিকেলে, মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টারও পরে, কবির মৃতদেহ নিয়ে তার ভক্ত এবং বন্ধু-বান্ধবসহ প্রায় হাজার খানেক মানুষ এগিয়ে যান লোয়ার সার্কুলার রোডের খ্রিস্টান গোরস্থানের দিকে। সেকালের বিবেচনায় এই লোক সংখ্যা খুব কম নয়। শবানুগমনে কলকাতার বাইরের বহু লোক অংশ নেন; অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ। তবে একদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ নিজের গ্রন্থ উৎসর্গ করে কবি যাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করেছিলেন, তাদের কেউ এই ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন না। মাইকেল যেখানে চলেছেন, সেই লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরস্থানে মাত্র চার দিন আগে কবিপত্নী হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কবির জন্যে কবর খোঁড়া হয় স্ত্রীর কবরের পাশে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যখন নিশ্চিতভাবে হতে চলেছে, তেমন সময়ে লর্ড বিশপের অনুমতি এসে পেছন-পেছন হাজির হলো। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো নামকরা পাদ্রী বা ধর্মীয় নেতা তার শেষকৃত্যে এসেছিলেন বলে জানা যায় নি। এমন কি, কৃষ্ণমোহনও নন। অনেক পাদ্রী বরং তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। রেভারেন্ড পিটার জন জার্বোই কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। চার্চের ব্যুরিয়াল রেজিস্টারে তার নাম পর্যন্ত ওঠানো হলো না। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত চার্চের রেজিস্টারে কবিকে এবং তার স্ত্রী হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করার কোনো তথ্য নেই।

কবি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে , স্বসমাজ ত্যাগ করে ইংরেজ হতে চেষ্টার কসুর করেন নি। শ্বেতাঙ্গিনীর সাথে ঘর করেছেন – হয়তো এই "অপরাধে"র জন্য সমকালের বাঙালি সারস্বত মহল তাঁর প্রতি সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। নয়তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন, তাঁকে নিয়ে বাঙালির গর্ব চিরকালীন হবার কথা। এই সাহিত্য প্রতিভার জন্যই তাঁর অ-গতানুগতিক আচরণ সত্বেও কবির প্রতি তারা আরো বেশি দরদী ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বাঙালি বিদ্দজনেরা সমুচিত সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয় না। সমকালীন সাহিত্য রসিকদের অনেক সময় লেগেছিল কবির সহিয ও সৃজনকে বুঝতে ও যথাযথ মূল্যয়ণ করতে।

কবি মধুসূদন আর এ পৃথিবীতে নেই । কিন্তু তিনি যে নবযুগের সৃষ্টি করেছিলেন , অরুণোদয়ের যে রক্তিম আভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যাকাশে উদিত হয়েছিলেন , তা তাঁর কাব্যের মাধ্যমে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে । বাঙালীর হৃদয়মন্দিরে কবি মধুসূদনের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে ।

** মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত সাহিত্য :

(১) **কাব্য ও কাব্যনাট্য** : তিলোত্তমা সম্ভব, ১৮৬৩ / দ্য ক্যাপটিভ লেডি (Ladie), ১৮৪৯ / রিজিয়া (Rizia : Empress of Inde), ১৮৫০ / ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ১৮৬১ /

(২) **মহাকাব্য** : মেঘনাদবধ কাব্য, ১৮৬১

(৩) **সনেট** : চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫

(৪) **পত্রকাব্য** : বীরাঙ্গনা, ১৮৬২

(৫) **নাটক** : শর্মিষ্ঠা ১৮৫৯ (বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক) / কৃষ্ণকুমারী ১৮৬১ / পদ্মাবতী ১৮৬০ / মায়াকানন

(৬) **প্রহসন** : বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ১৮৬০ / একেই কি বলে সভ্যতা ১৮৬০

তথ্যসূত্র : আশার ছলনে ভুলি, গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৫